ইউনিট ৪: সমাজ, শিক্ষা ও রাজনৈতিক ভাবনা: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

ভূমিকা

বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের সমাজগুলোতে সামাজিক, শিক্ষা ও রাজনৈতিক ভাবনা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উচ্চ শিক্ষায় এ বিষয়ক আলোচনা প্রয়োজন। তথ্য-প্রযুক্তির বদৌলতে বিশ্বায়নের ফলে বাংলাদেশের সমাজ, শিক্ষা, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। বিশ্বায়নের ফলে বা প্রগতিশীলতার আলোকেই বাংলাদেশের শিক্ষা, রাজনীতি, সামাজিক বিষয়ক কর্মকাণ্ডে ও আলোচনায় বা ভাবনায় পিছিয়ে আর থাকার সুযোগ নাই। সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতি, দ্রুত উৎপাদনশীলতা, সুশৃঙ্খল আস্থাপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে, সুস্থ প্রগতিশীল শিক্ষা বান্ধব টেকসই পরিবেশ গড়ে তুলতে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সর্বাগ্রে যা উপরোক্ত ধারণাগুলোকে নিয়ে সমন্বিত রূপ লাভ করবে।

পৃথিবীর অগ্রগতির মূল চালিকা শক্তিই শিক্ষা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শিক্ষার মূল্যবোধ রাষ্ট্রে প্রতিফলিত হবে, রাষ্ট্রের মৌলিক চরিত্র এবং সমাজের বিশিষ্ট ভাব সৃষ্টিতে অবদান রাখবে এটাই প্রত্যাশিত। ১৯৭৪ সালে ডক্টর কুদরাত-ই-খুদার নেতৃত্বে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ দেশকে একটি অসাধারণ, সুদুর প্রসারী, প্রত্যয়দীপ্ত শিক্ষা পরিকল্পনা উপহার দিয়েছিলেন। মূলে ছিল নতুন রাষ্ট্রের ভাবাদর্শ সম্বলিত সংবিধান গৃহীত রাষ্ট্রের মূলনীতিসমূহ।

সমাজ রাজনীতি সংস্কৃতি ও মৌলিক বিশ্বাসসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে কোন দেশের জাতীয় আদর্শ। জাতীয় আদর্শ ও শিক্ষা বিষয় দুটি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। যে কোন সমাজই তার জাতীয় আদর্শকে লালন ও বিকাশ সাধন করে উন্নততর জীবন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়। এ জন্য শিক্ষাকেই জাতীয় আদর্শের ধারক হতে হয়।

আলোচনার সুবিধার্থে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব উপলব্ধি করে এই ইউনিটকে মোট ৫টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

এই পাঠগুলো হচ্ছে-

পাঠ ৪.১ : বাংলাদেশের শিক্ষা ভাবনা ও বাংলাদেশ দর্শন

পাঠ ৪.২ : নৈতিকতা ও আমাদের সমাজ

পাঠ ৪.৩ : আর্থ-সামাজিক দর্শন ও বাংলাদেশ

পাঠ ৪.৪ : বাংলাদেশের নৈতিক মূল্যবোধের সংকট ও তা উত্তরণে দর্শন ও দার্শনিকবৃন্দের ভূমিকা

পাঠ ৪.৫ : শিক্ষা ভাবনায় ইতিহাস ও ঐতিহ্য

পাঠ- ৪.১: বাংলাদেশের শিক্ষা ভাবনা ও বাংলাদেশ দর্শন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের শিক্ষা ও দর্শনের পারস্পারিক সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশ শিক্ষা সম্পর্কে সাম্প্রতিক ভাবনাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সংবিধান একটি জাতীর আশা আকাঙ্খার প্রতীক। একটি দেশের জাতীয় আদর্শ ও দর্শন প্রতিফলিত হয় সংবিধানে। বাংলাদেশের শিক্ষানীতি, শিক্ষাব্যবস্থাও এই দলিলের উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তর শিক্ষা ব্যবস্থা। জনসংখ্যার আধিক্য, দারিদ্র্য, সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের অভাব, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অপারগতা যুগোপযোগী শিক্ষানীতি ও শিক্ষাক্রম প্রণয়নে জাতীয় ঐক্যমতের অভাব, বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রকল্পের মধ্যে সমন্বয়হীনতা বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তারপরেও বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তর শিক্ষা ব্যবস্থা। অন্যদিকে এই বিষয়টি বহুল আলোচিত বিষয় এবং এই বিষয়টি বাংলাদেশের সকল ধরনের নাগরিককে স্পর্শ করে।

পূর্বে আলোচিত শিক্ষার ব্যাখ্যায় বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য যে এদেশে সমাজের সকল স্তরে শিক্ষার সুযোগ সমভাবে পৌঁছায়নি। কিন্তু সর্বস্তরে আগ্রহ রয়েছে। বহুধা সমস্যায় জর্জরিত বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কোনটি পুরাতন, কোনটি হালনাগাদ বিভিন্ন মানের বিভিন্ন স্তরের সমাজের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে।

অন্য দিকে একটি সভ্য মানব গোষ্ঠী অধ্যুষিত জনপদ হিসেবে বাঙ্গালীর ইতিহাস সুপ্রাচীন। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এশিয়ার মানচিত্রে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় নিঃসন্দেহে একটি বিস্ময়কর, স্মরণীয় ঘটনা। বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডে তিনটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধদের বসবাস। এদের প্রত্যেকের রয়েছে নিজস্ব ধর্ম, দর্শন, জীবনবোধ ও সংস্কৃতির সুদীর্ঘ কালের সুমহান স্বকীয় ঐতিহ্যের ইতিহাস। তারা ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে বাস করছে। বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছে। তারা সকলে মিলিতভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি আকুণ্ঠ শ্রদ্ধাবান হয়ে স্থায়ী শান্তি প্রগতি ও উন্নয়নের জন্য সংঘবদ্ধভাবে কাজ করছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের সীমানায় বাঙ্গালী হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধদের জীবনবোধের ও জীবনাচারের এমনকি ধর্মবোধের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বাংলার বাহিরের সাথে এই বাঙ্গালীদের ঐক্য বা মিল কোন কালেই ছিল না। এ দেশবাসী এক অভিন্ন জাতীয়তাবোধের চেতনায় আবদ্ধ। সুদীর্ঘ চার হাজারের অধিক কালের বাঙ্গালীর দার্শনিক ইতিহাস ধারণ করেছে বাঙ্গালীরা। বাংলার আদিম অধিবাসী নিষাদ,পুন্ড্র যাদের বংশধরেরা বাংলাদেশে কোল, পুলিন্দ, শবর, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল নামে পরিচিত। আর্যদের আগমনে আর্য অনার্য সংমিশ্রণে বাংলার সামাজিক ধর্মীয় সাংস্কৃতিক জীবন দর্শন নতুন রূপ লাভ করে। পরবর্তীকালে বাংলায় বৌদ্ধ ও মুসলিমদের আগমনে এবং মুসলমানদের সুদীর্ঘ শাসনকালে বাঙ্গালীদের জাতীয় ঐক্য, শান্তি ও সমৃদ্ধি ঘটে। মুসলিম শাসনের ছয়শত বছরে বিশেষভাবে মুসলিম আমলে আড়াইশত বছরে হিন্দু, মুসলিম ও বৌদ্ধদের একটি সম্মিলিত জাতি গড়ে উঠেছিল। শাসক ও শাসিতের মধ্যে এক অভূতপূর্ব মিশ্রণ, ঐক্য ও সহযোগীতা। পৌনে দুইশত বছরের ইংরেজ শাসনে ও পাকিস্তানী শাসনামলে বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিল্প সাহিত্যে চিন্তা চেতনায় ফাটল ধরাতে চেয়েছিল। ইতিহাসের আসল বাংলা, আদি বাংলা, বৌদ্ধ হিন্দু পাঠান

মোঘল আমলের বাংলা, বাঙ্গালীর বাংলা চিরকাল সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে জাতীয় ঐকের মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতীয়তাবোধের চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে চিরকাল বেঁচে থাকবে– এই ছিল বাংলাদেশের দর্শনের ইতিহাস।

বাংলাদেশের শিক্ষা ও দর্শনের পারস্পারিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে বলা যায় যে বাংলাদেশের শিক্ষা দর্শন প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার সমাজ দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। মুসলিম শাসনামলের পূর্বে বাংলাদেশে একটি সুসংবদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল যা তৎকালীন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চাহিদা মেটাতে সক্ষম ছিল। ওদন্তপুরী, বিক্রমশীলা, সোমপুর, পাহাড়পুর, সীতাকোট, শালবন বিহার সেকালের উচ্চ মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। সেখানে একদিকে যেমন- ধর্ম ও ন্যায় শাস্ত্র, ব্যাকরণ, কাব্য পাঠের পাশাপাশি বিজ্ঞান ও বৃত্তিমূলক, কৃষি, জলবিজ্ঞান, সেচ পদ্ধতি ও কারিগরী শিক্ষাও শিক্ষার্থীদের দেওয়া হত।

অন্যদিকে হিন্দু বৌদ্ধ যুগে শিক্ষা পদ্ধতি টোল চতুস্পাঠীতে সীমাবদ্ধ ছিল আর মুসলিম আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা মক্তব মসজিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল। অষ্টাদশ শতকে একটি জলাবদ্ধ স্থবির সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে শিক্ষা ছিল টোল, পাঠশালা, চতুস্পাঠী জাতীয় শিক্ষায়তনে এবং মক্তব ও মাদরাসায় সীমাবদ্ধ। কোম্পানী আমলের আলীয়া মাদরাসা ও সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাদান হতো সনাতনী বিষয় ও প্রথায় যার উদ্দেশ্য ছিল। মোল্লা ও পুরোহিত সৃষ্টি। অন্যদিকে এ ধরনের শিক্ষার মাধ্যমে ইংরেজদের উদ্দেশ্যও চরিতার্থ হয়েছিল-সমাজকে অন্ধ রাখা, শাসন ও শোষণের সুবিধা নিশ্চিত করার মাধ্যম। মূলত গভীর বিশ্লেষণে এটাই প্রতীয়মান হয় যে ইংরেজরা চাইতো এদেশবাসীর জন্য সনাতন বিদ্যা শিক্ষা আর হিন্দুরা চেয়েছিল পশ্চিমা তথা আধুনিক শিক্ষা। পরবর্তীকালে তৎকালীন প্রগতিশীল হিন্দু সমাজের শিক্ষাদর্শনের স্বরূপ বোঝা যায় তাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে। মানবতাবাদী উদার দৃষ্টিভঙ্গি যা সমাজকে স্বচ্ছ দৃষ্টি সম্পন্ন ও সৃষ্টিশীল করে চলমান স্রোতস্বিনীতে রূপান্তর করেছে। সে সময় একটি সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণির ও সৃষ্টিশীল বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে যারা সমগ্র সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। ইংরেজ আসার আগে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রীক রূপ তেমন জানা না থাকলেও হিন্দু মুসলিম শাসনামলে ধর্মীয় দর্শনের উপর এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। সুলতানী বা মোঘল শাসনাধীন বাংলায় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রয়োজনে একটি সার্বিক শিক্ষাদর্শন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। অর্থাৎ সামাজিক প্রভাব শিক্ষায় প্রতিফলিত হয়েছিল।

পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি জাতীয়তাবাদী শিক্ষা ধারার একটি আন্দোলন গড়ে উঠে যার উদ্দেশ্য ছিল মূলত দেশকে ইংরেজ শাসন থেকে মুক্ত করা এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইংরেজ সরকারের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত রাখা। ইংরেজ পরবর্তী পাকিস্তান পর্বে বিভিন্ন কমিশনের শিক্ষা দর্শন হল একটি সাধারণ ভাষা, ধর্মবোধ ও পাকিস্তানী ঐতিহ্য সংস্কৃতি সৃষ্টির মাধ্যমে একটি পাকিস্তানী জাতি তৈরিতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে কাজে লাগানো।

স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-ই-খুদার নেতৃত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেছিলেন। প্রতিবেদনে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা দর্শনের দিকটি এভাবে প্রতিফলিত হয় 'বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতার সুস্পষ্ট বোধ শিক্ষার্থীর চিত্তে জাগ্রত করে তাকে সুনাগরিক রূপে গড়ে তোলাই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য'। পরবর্তী শাসনামলগুলোতেও শিক্ষা সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন কমিটি, কমিশন, সেমিনার অনুষ্ঠিত হলেও খুব একটা বিবেচনা প্রসূত ফল দেখা যায়নি। রাষ্ট্রীয় দর্শনের সাথে সাথে আমাদের শিক্ষা দর্শনের তৎক্ষণিক পরিবর্তন ঘটেছে যা সর্বদা হওয়া উচিত সমাজ ও সংস্কৃতির সম্পৃক্ততায়। বাংলাদেশের মানুষের জীবনবোধ ও জীবনচর্চার সাথে নিবিড়ভাবে আবিষ্ট হয়েই এ দেশের শিক্ষা দর্শনও শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠা উচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বাংলার আদীম অধিবাসী কারা?
ক. কোল, পুলিন্দ, হাড়ি, চন্ডাল
খ. আর্য, অনার্য, কোল, মুচি
গ. ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র
ঘ. হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্মণ

২. কোনগুলো প্রাচীন কালের উচ্চমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান–
i. ওদন্তপুরী, পাহাড়পুর, সীতাকোট
ii. বিক্রমশীলা, সোমপুর, শালবন
iii. পাহাড়পুর, সোমপুর, বিক্রমশীল
উপরের সবগুলো
ক. i
খ. ii ও iii
গ. i, ii, iii
ঘ. i, iii

৩. ব্রিটিশ ভারতে ইংরেজদের শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল–
ক. মোল্লা ও পুরোহিত তৈরি করা
খ. শাসন ও শোষণ করা
গ. সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি করা
ঘ. সৃষ্টিশীল বুদ্ধিজীবী শ্রেণি তৈরি করা।

উত্তরমালা: ১. ক, ২. ঘ, ৩. ক

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১. বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কী?
২. বাংলাদেশে বসবাসকারী বৃহৎ জনগোষ্ঠী কারা?
৩. প্রাচীনকালে বৌদ্ধ বিহারগুলির শিক্ষণীয় বিষয়গুলো কী?
৪. স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম শিক্ষা কমিশন কখন কার নেতৃত্বে গঠিত হয়?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন:

১. বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা ব্যাখ্যা করুন।
২. বাংলাদেশের শিক্ষা সম্পর্কে আপনার ভাবনা ব্যক্ত করুন?

পাঠ- ৪.২: নৈতিকতা ও আমাদের সমাজ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নৈতিকতা কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সমাজের নৈতিকতার বিস্তার ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের সমাজে নৈতিকতার স্থান নির্দেশ করতে পারবেন।

মানুষের নৈতিক জীবন ও নৈতিকতার মূল ভিত্তি হল পরিবার থেকে গড়ে ওঠা মূল্যবোধ। জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ যে নৈতিক মূল্যবোধ লালন ও অনুসরণ করে তার উৎস হচ্ছে পরিবার। সহস্র বছরের ঐতিহ্যবাহী সভ্যতা ও সংস্কৃতির পাদপীঠ বাংলাদেশ। এ সমাজে পারিবারিক ঐতিহ্য আবহমান কাল ধরে টিকে আছে এবং তা বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত করছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালের নগরায়ন, বিশ্বায়ন, অর্থনৈতিক জীবনের দ্রুত প্রসার ও উন্নয়ন, প্রযুক্তি, বিশেষত তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, গণমাধ্যমের প্রসার, টেলিভিশন ও প্রমোদ-বাণিজ্যের বিস্ফোরণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশ্বায়ন ও দ্রুত প্রসার, বৈশ্বিক ও দেশীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি এবং শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ পরিবারের সংস্কৃতিকে প্রভূতভাবে প্রভাবিত করছে এবং ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধকে দ্রুত পরিবর্তিত করছে।

মানুষের অন্তর্জগতের উন্নতিই তার নৈতিক মানের উন্নয়ন। শিক্ষা, ধর্ম, নীতিবোধ সবকিছুই সামাজিকীরণে সহায়তা করে। ব্যক্তিগত নৈতিক গুণাবলিগুলো সামাজিক পরিবেশে বিকশিত হয়। আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ বিবেচনায় রেখে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়েছে। যেমন ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক,বিজ্ঞান ভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে পরিচিতি, আচরণগত উৎকর্ষ সাধন এবং জীবন ও সমাজে নৈতিক মানসিকতা সৃষ্টি ও চরিত্র গঠন। নৈতিকতা হল ভাল ও খারাপ বিষয়সমূহের মধ্যে উদ্দেশ্য সিদ্ধান্ত ও প্রতিক্রিয়াসমূহের মধ্যে পার্থক্য ও পৃথকীকরণ। নৈতিকতা একটি আদর্শিক মানদণ্ড যা বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিকতা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতির মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। অন্যদিকে, সামগ্রিকভাবে সমগ্র পৃথিবীর জন্য কল্যাণকর বিষয়গুলিকেও নৈতিকতা হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে ব্যক্তি সামাজিক মূল্যবোধ শিক্ষা লাভ করে ও সমাজের নিয়মকানুন, রীতি অনুসরণ করে চিন্তা ও কাজ করতে শেখে। আমাদের সমাজে সামাজিকীকরণে পরিবার, বিদ্যালয়ের এবং সমাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নীতি, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, ভালমন্দের পার্থক্য, সুকুমার বৃত্তির চর্চা, সাংস্কৃতিক আচার আচরণ সবই প্রতিষ্ঠান হতেই শিশুরা শেখে।

সাম্প্রতিককালের বিশ্বায়নের যুগে পারিবারিক মূল্যবোধ, নীতি, নৈতিকতার ব্যাপক অবক্ষয় ঘটেছে। ফলে শিশুটি এসব ছাড়াই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসে। পাঠ্যপুস্তক, জাতীয় শিক্ষানীতি, শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য অত্যন্ত মহৎ। একজন আর্দশ সৎ চরিত্র ও নীতিবান মনুষ্যত্ববোধ সম্পন্ন মানুষ তৈরি এর মূল লক্ষ্য। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের অনুশীলনে এই বিষয়ের নিয়মিত চর্চা মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ অনুপস্থিত থাকে। ফলে আমাদের সমাজে সময়ের সাথে সাথে এর মারাত্মক অবনতি ঘটছে। পরিবার যখন এর নৈতিকতা মূল্যবোধ বিকাশে দায়িত্ব পালন করতে পারে না, তখন তার দায়িত্ব বর্তায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর। দেখা যাচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নানা প্রতিকূলতায়,

অবহেলায়,উদাসীনতায় এই দায়িত্ব পালন করছে না। ফলে শিশুরা এর ফল ভোগ করছে এবং খারাপ কিছু দ্রুত সমাজে ছড়াচ্ছে। আজকের সমাজের অবক্ষয়, নৈতিকতার অভাব তারই পরিণাম। নকল প্রবণতা, প্রশ্নপত্র ফাঁস, শিক্ষার্থীদের অসুস্থ ধারার রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, মারামারি, সেশনজট, দলাদলি, গণ্ডগোল, শিক্ষার্থীদের অসহিষ্ণুতা, অসামাজিক আচরণ, মাদক গ্রহণ এগুলো সামাজিক ব্যাধি রূপ পরিগ্রহ করেছে। আর এ সব কিছুর মূলে আমাদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অনুপস্থিতি। নীতি, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় সমাজে এমন এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। পরীক্ষায় নকল প্রবণতার জন্য একদিকে যেমন শিক্ষক শিক্ষার্থীর উভয়ের পাঠদান ও গ্রহণে বিমুখতা, ত্রুটিপূর্ণ প্রশ্ন ও পরীক্ষা পদ্ধতি, কক্ষ পরিদর্শকদের দায়িত্ব পালনে অনীহা রয়েছে তেমনই রয়েছে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামাজিক অক্ষয়ের পরিবেশ। শিক্ষক, কর্মচারী অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র ফাঁসের মত গর্হিত কাজে জড়িয়ে পড়েন।

নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। নৈতিক শিক্ষা আমাদের সমাজের সকল স্তরের মানুষের দরকার। ব্যক্তি জীবনের আদর্শরূপ ফুটিয়ে তুলতে শিক্ষার্থীর মধ্যে সর্বজনীন আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে। আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ মানুষকে সত্যনিষ্ঠ করে তুলবে। এ ক্ষেত্রে পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করা প্রয়োজন। পরিবারে নৈতিক শিক্ষাদানকে প্রসারিত ও সুদৃঢ়করণ করা প্রয়োজন। শিশুদের মধ্যে নৈতিক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব প্রদান করার ক্ষেত্রে পিতা মাতাদের উৎসাহ জোগানো প্রয়োজন। পরিবারের পর যে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মানুষের নৈতিক জীবনে সবচেয়ে বেশি ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে তা হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে জাতীয় শিক্ষানীতির ২০১০ এর আলোকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশ সম্পর্কিত তথ্য ও নির্দেশনা সংযোজন করা হয়েছে। শুধু পাঠ্যপুস্তক বা তথ্য সরবরাহে নয়, বক্তৃতায় নয়, যতক্ষণ এগুলো অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তি আচরণে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে যুক্ত না হবে ততক্ষণ এগুলো পুঁথিগত বিদ্যাই থাকবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. নৈতিক শিক্ষা আমাদের সমাজের কোন স্তরের মানুষের জন্য দরকার?
   ক. কৃষক
   খ. ব্যবসায়ী
   গ. চাকুরিজীবী
   ঘ. সকল স্তরের

২. কোন ধরনের মূল্যবোধ মানুষকে সত্যনিষ্ঠ করে তোলে?
   ক. সামাজিক মূল্যবোধ
   খ. আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ
   গ. অর্থনৈতিক মূল্যবোধ
   ঘ. সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ

৩. পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধরনের অবহেলার ফল কারা ভোগ করে?
   ক. শিশুরা
   খ. যুবক শ্রেণি
   গ. প্রবীণ শ্রেণি
   ঘ. সকলে

৪. সমাজ অবক্ষয়ের মূল কারণ কী?
   ক. আর্থিক অনটন
   খ. রাজনৈতিক প্রভাব
   গ. নৈতিকতার অভাব
   ঘ. সেশন জট

উত্তরমালা: ১. ঘ, ২. খ, ৩. ক, ৪. গ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ধর্ম ও নৈতিকতা শিক্ষার উদ্দেশ্য কী?
২. নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা লিখুন?
৩. আধুনিক পরিবার শিশুর নৈতিক শিক্ষার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারছে না কেন?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. নৈতিকতা কী? আধুনিক কালে শিক্ষার্থীর নৈতিকতার বিকাশে সমাজের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ- ৪.৩: আর্থ-সামাজিক দর্শন ও বাংলাদেশ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষায় বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক দর্শন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের সংবিধান জনগণের জন্য একটি সর্বজনীন, গণমুখী এবং বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থার অঙ্গীকার করেছে। সমাজের প্রয়োজনের সাথে শিক্ষাকে সম্পৃক্ত করা এবং সেই প্রয়োজন অনুযায়ি দক্ষ ও নিবেদিত নাগরিকদের গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। নিরক্ষতার অন্ধকার থেকে জাতিকে মুক্ত করার কথাও আইনগতভাবে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। শিক্ষাই আমাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রধান ও সহজতম পথ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন আমাদের সকল সমস্যার সবচেয়ে বড় রাস্তা হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা আর জীবন আলাদা করে দেখার সুযোগ নাই। আর জীবনের মান উন্নয়নই যদি হয় উন্নয়নের লক্ষ্য তাহলে শিক্ষার ওপর স্বাভাবিক নিয়মেই বেশি করে আলো ফেলতে হবে।

বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক কাঠামো কৃষির উপর এখনো নির্ভরশীল। কারণ আমাদের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা কৃষি উৎপাদন কেন্দ্রিক। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল সমাজ যথার্থই একটি পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। প্রাক উপনিবেশিক বাংলার কৃষকেরা ভোগ দখলের ক্ষেত্রে স্বাধীন হলেও রাষ্ট্র ও খাজনা আদায়কারী শ্রেণি জমিদার দ্বারা শোষিত হত। উপনিবেশিক শাসকেরা একদিকে সচেতনভাবে খোরাকী নির্ভরতা বজায় রাখে অন্যদিকে ১৭৯৩ সালে প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে পুঁজিবাদী সম্পর্কের উদ্ভব ঘটে যার ফলে সমাজে একদিকে দরিদ্র শ্রেণি অন্যদিকে জমিদার জোতদার শোষক এবং ভূমি বিচ্ছিন্ন পরজীবী শ্রেণির উদ্ভব ঘটাতে সক্ষম হয়। ১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গ জমিদার অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন জারী হওয়ার মাধ্যমে কৃষক পুনরায় তার ভূমি অধিকার ফিরে পায় এবং কোন মধ্যস্বত্ব ভোগী শ্রেণি ছাড়াই কৃষক ও রাষ্ট্রের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং বাংলাদেশের কৃষি কাঠামো এখন এভাবেই চলছে। আধুনিককালে বাংলাদেশের মানুষও দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রত্যাশী। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি প্রবাহ বাংলাদেশকে বিশ্বায়নের অন্তর্ভুক্ত করেছে। মানুষ এখন চায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সুষম আয় ও বণ্টন ব্যবস্থা, উন্নত অবকাঠামো ও ভাল মানের সেবা। বাংলাদেশের সামজিক জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে জনসংখ্যা আধিক্য, দারিদ্র, বেকার সমস্যা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, দুর্নীতি ইত্যাদি। আর এ সকল সমস্যার মূলে রয়েছে শিক্ষার অনগ্রসরতা, যে শিক্ষার অর্থ অনেক ব্যাপক। শিক্ষার অনগ্রসরতা একটি দুষ্টচক্র হিসাবে জাতীয় উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করছে। বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে বাংলাদেশের শিক্ষার অবস্থা বোঝা যায়। দেশের সংবিধান ও আইনে এবং সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় প্রতিটি নাগরিকের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। সর্বজনীন মূল্যবোধ, মানবসম্পদের উন্নয়ন ও দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ উন্নয়নের পূর্বশতই হচ্ছে শিক্ষা। কিন্তু সকলের জন্য মানসম্মত শিক্ষা, শিখন বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করণ, মানসম্মত শিক্ষক, পাঠ্যপুস্তক, দারিদ্র্য দূর করা এখানো সম্ভব হয় নাই। সকল শিক্ষা কর্মসূচির জন্য প্রয়োজন শিক্ষার্থীদের পুষ্টি, মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা, জেন্ডার সমতা, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মূল ধারায় নিয়ে আসা। শিক্ষায় প্রবেশের প্রতিবন্ধতা হিসাবে লিঙ্গ, বয়স, পরিবার, নৃতাত্ত্বিক, ভাষাগত ও ভৌগোলিক পার্থক্য দূরীকরণ একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অবস্থায় উপরোক্ত বৈষম্য বা সমস্যাগুলো এখনো প্রকট। তবে সরকার মৌলিক শিক্ষা সুনিশ্চিতকরণ, শিক্ষকদের মর্যাদা, প্রশিক্ষণ ও গুণগত মানের উন্নয়ন, শিক্ষণ সামগ্রীর উন্নয়নে সচেষ্ট রয়েছে। সরকারের একার পক্ষে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করা সম্ভব

নয়। এর জন্য প্রয়োজন সমাজের সক্রিয় সহযোগিতা ও উন্নয়নের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। নানা ধরনের আদেশ নিষেধের প্রজ্ঞাপন জারি করেও শিক্ষকদের কোচিং সেন্টার, অর্থের বিনিময়ে পাঠদানের প্রবণতা কমে নাই। নকল প্রবণতা, প্রশ্নপত্র ফাঁসের মত সামাজিক ব্যাধিও কমে নাই। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও শিক্ষার উচু স্তরে একই সমস্যা বিরাজমান। অর্থনৈতিক দুর্বলতা শিক্ষার উন্নয়নে প্রধান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারি বেসরকারি যে বৈষম্য বিরাজমান তা পর্যায়ক্রমে দূর করতে হবে। সমযোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিভিন্ন স্তরের ও ধারার শিক্ষকদের মধ্যে বিরাজিত বেতন ভাতার বৈষম্য দূর করা প্রয়োজন। শিক্ষা খাতে জাতীয় আয়ের বরাদ্দ আরো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মনিটরিং জোড়দার করা প্রয়োজন। শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টিকারক পরিবেশগত ও মনস্তাত্ত্বিক কারণসমূহ নিরসণের জন্য দৃঢ় ও সচেতন রাষ্ট্রিয় ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের জন্য শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নয় তার বাইরে খেলার মাঠ, পাঠাগার, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা, শিখন বান্ধব পরিবেশের নিশ্চয়তা বিধান প্রয়োজন।

একবিংশ শতাব্দীর উন্নয়ন প্রকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে এবং মধ্যম আয়ের প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে দক্ষ জনশক্তি, আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি, বিজ্ঞান মনস্ক ও সৃজনশীল উদ্ভাবনী ক্ষমতা সম্পন্ন আলোকিত মানুষ দরকার। গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষাই পারে বাংলাদেশকে সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছে দিতে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. প্রাক উপনিবেশিক আমলে বাংলার কৃষকেরা কাদের দ্বারা শোষিত হতো?
   ক. সাধারণ মানুষ
   খ. জমিদার
   গ. ব্যবসায়ী
   ঘ. সকলের দ্বারা

২. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় কত সালে?
   ক. ১৫৯৩ সালে
   খ. ১৬৯৩ সালে
   গ. ১৭৯৩ সালে
   ঘ. ১৮৯৩ সালে

৩. শিক্ষার উন্নয়নে প্রধান প্রতিবন্ধকতা কী?
   ক. অর্থনৈতিক দুর্বলতা
   খ. সমাজের অবহেলা
   গ. রাজনৈতিক অস্থিরতা
   ঘ. ধর্মীয় গোঁড়ামী

উত্তরমালা: ১. খ, ২. গ, ৩. ক

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষার অনগ্রসরতা আমাদের সমাজ জীবনে কী কী সমস্যা সৃষ্টি করেছে?
২. শিক্ষায় প্রবেশের প্রতিবন্ধকতাগুলো কী?
৩. শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশে কী কী কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করুন।
২. সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ কীভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী প্রতিবন্ধকতা দূর করতে পারে?

পাঠ- ৪.৪: বাংলাদেশের নৈতিক মূল্যবোধের সংকট এবং তা উত্তরণে দর্শন ও দার্শনিকবৃন্দের ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নৈতিক মূল্যবোধের ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের নৈতিক মূল্যবোধের সংকটের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সংকট নিরসনে দার্শনিকবৃন্দের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

নৈতিক মূল্যবোধ একটি জাতির দর্শন এবং শিক্ষা ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ। একজন আদর্শ ব্যক্তির জীবনের গুণাবলিকে মূল্যবোধ বলে। আধুনিক ধারণা অনুসারে মূল্যাবোধ হল কতগুলো জৈব মানসিক সংগঠনের এমন এক সমন্বয় যা পরিবেশের বহু বিস্তৃত অংশকে সক্রিয়তার দিক থেকে সমগুণ সম্পন্ন করে তোলে এবং ব্যক্তির মধ্যে উপর্যুক্ত আচরণ সৃষ্টি করে। অন্যদিকে যে কোন পরিস্থিতিতে ব্যক্তিকে উচিত অনুচিতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। ব্যক্তির এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর জীবন সফলতা বিফলতা নির্ভর করে। এই ভালমন্দ উচিত অনুচিত বিচারের জন্য যে মূল্যবোধ তাকে বলা হয় নৈতিক মূল্যবোধ। নৈতিক মূল্যবোধ ব্যক্তিকে তার আচরণকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করে। সুতরাং, নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। নৈতিক মূল্যবোধের সংকট থেকে জাতিকে মুক্ত করতে হলে শিক্ষার বিকল্প নেই। শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষার যথেষ্ট উপাদান পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন বিষয়বস্তুতে সন্নিবেশিত রয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে যখন শিক্ষা আজকের মত সংগঠিত রূপ পরিগ্রহ করেনি, সে সময়েও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষা দেওয়া হত। বাংলাদেশের সংবিধানে মূল্যবোধ শিক্ষার লক্ষ্য ও চিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে যা আদর্শ নীতি শিক্ষার পরিপূরক। প্রতিফলিত বিষয়গুলি হল গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা, সাম্য, ন্যায়-নীতি, ঐক্য ও জাতীয় সংহতি। আমাদের সমাজ ব্যবস্থার কিছু প্রাচীন ন্যায়-নীতিবোধ প্রচলিত আছে যা বাঙালীরা তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ধারার বাহক হিসাবে গ্রহণ করেছে, যেমন সত্যবাদিতা, অহিংসা, শান্তি, ক্ষমা, অধ্যবসায়, সারল্য, জ্ঞান পিপাসা, সহনশীলতা, সহযোগিতা, বয়স্ক ও গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা। এই মূল্যবোধগুলো নানা ভাষা ও নানা মতের সাহিত্যকে অবলম্বন করে রচিত। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষার অস্তিত্ব বিদ্যমান। চলতি শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট বহু বিষয়ের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের অথবা মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদান বিদ্যমান। তারপরেও বলা যায় বাংলাদেশে নৈতিক মূল্যবোধের সংকট বিরাজমান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্তমান মূল্যবোধের সঙ্গে আধুনিক জীবনের চাহিদার সংঘাতের ফলে সংকট সৃষ্টি হয়েছে। মূল্যবোধের সংকট বর্তমান সমাজে প্রকট আকার ধারন করেছে। নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় সর্বত্র বিরাজমান। দুর্নীতির ব্যাপক পাদুর্ভাব, সন্ত্রাসের ঘনঘটা, তরুণ সমাজের হতাশা ও লক্ষ্যহীনতার মর্মান্তিক চালচিত্র- এ সবকিছুর সমন্বয়ে যে মানবিক সংকটাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তা নিঃসন্দেহে আশঙ্কাজনক। ব্যক্তিজীবনে এই মূল্যবোধের সংকট বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। আধুনিক বাংলাদেশের সমাজের প্রকৃতি বিচার করলে আমরা দেখতে পাই সামাজিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক, ধর্মীয় মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়। ঘুষ, দুর্নীতি, সামাজিক সংঘাত, ধর্মীয় গোঁড়ামী, নৈতিক অধঃপতন

ইত্যাদিতে দেশ ছেয়ে গেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিখনবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির বদলে স্থূল রাজনীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে।

জাতি হিসাবে অগ্রগতি অর্জন করতে হলে এবং বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাড়াতে হলে আমাদের সমন্বিত অর্থনৈতিক ও নৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। মূল্যবোধের সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার্থীদের মনে গণতান্ত্রিক জীবনাদর্শের মূল্যবোধ জাগানো, গতানুগতিক ও আধুনিক জীবন ধারার মধ্যে সংঘাত এড়ানো। জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তি নির্ভর জীবনের সাথে জীবনাদর্শের সামঞ্জস্য করতে না পারলে মানুষের মনের মূল্যবোধের সংকট দূর করা যাবে না। ফলে সমাজে নিরাপত্তা শান্তি ফিরে আসবে না। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নৈতিক মূল্যবোধের সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা উচিত।

অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য একদিকে সকল ধরনের কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি, স্বাধীন কর্মপন্থা নির্বাচন, আত্মনিয়ন্ত্রণের ও আত্ম সচেতনতার ক্ষমতা থাকবে। অন্যদিকে ব্যক্তির ধর্মের অনুশাসন, মৌলিক নীতি বা বিশ্বাস সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বিনিময় প্রয়োজন। নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশে প্রধান ভূমিকা রাখে শিক্ষক। শিক্ষককে এ কাজগুলো করতে হবে কতগুলো নিয়ম ও পর্যায় অনুসরণ করে। শিক্ষার ৪টি মৌলিক উপাদান রয়েছে। যেমন– (ক) শিক্ষার্থী (খ) শিক্ষক (গ) পাঠ্যক্রম এবং (ঘ) শিক্ষার পরিবেশ বা প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে শিক্ষক হচ্ছেন অন্যতম উপাদান। শিক্ষাদান কাজে ও শিক্ষার্থীকে ভাল মানুষ রূপে গড়ে তুলতে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষকের উপর। শিক্ষক প্রসঙ্গে বিভিন্ন দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, উত্তম শিক্ষক হবেন উত্তম ছাত্র। শিক্ষকের ছাত্রত্ব গ্রহণে তাঁর মনের তারুণ্য নষ্ট হতে পারে না বরং তিনি সব সময় ছাত্রদের সুবিধা অসুবিধা ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হবেন এবং এ কারণেই তিনি শিশুদের মনের কাছাকাছি থাকবেন। পার্সিভেল রেন বলেছেন শিক্ষক শুধু খবরের উৎস বা ভাণ্ডার নন কিংবা প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার তথ্য সাংগ্রহকারী নন; শিক্ষক শিশুর বন্ধু, পরিচালক ও যোগ্য উপদেষ্টা। একজন সুদক্ষ শরীর গঠনকারী, শিশু মনের বিকাশ সাধনের সহায়ক তথা তাদের চরিত্র গঠনেরও নিয়ামক। শিক্ষা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাপদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে বিশিষ্ট চিন্তাবিদগণ, দার্শনিকগণ গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে অতীতকাল থেকে সাম্প্রতিক কালের শিক্ষার সমস্যার অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমাধান বা দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। এরাই হলেন শিক্ষার পথিকৃত। নৈতিক মূল্যবোধের সংকটে দার্শনিকদের বক্তব্য অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। পূববর্তী অধ্যায়ে বিশিষ্ট শিক্ষা দার্শনিকবৃন্দের বক্তব্য জীবন আলোচনা করা হয়েছে। তাদের অবদান শিক্ষায় যে অতুলনীয় তা বলাই বাহুল্য। তাদের যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তা নৈতিক মূল্যবোধের সংকটে প্রেরণা জোগায়, মনে উদ্দীপনা আনে। সমাজের মানুষ চেষ্টা করে বিপদ থেকে, অনৈতিকতা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশে প্রধান ভূমিকা রাখেন কে?
   ক. দার্শনিক
   খ. সমাজ বিজ্ঞানী
   গ. মনোবিজ্ঞানী
   ঘ. শিক্ষক

২. উত্তম শিক্ষক হবেন উত্তম ছাত্র কোন দার্শনিক বলেছেন?
   ক. প্লেটো
   খ. এরিস্টটল
   গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
   ঘ. পার্সিভেল রেন

৩. শিক্ষার মৌলিক উপাদান কয়টি?
   ক. ২টি
   খ. ৩টি
   গ. ৪টি
   ঘ. ৫টি

৪. ব্যক্তিকে সঠিক পথে পরিচালিত করে কোন ধরনের মূল্যবোধ?
   ক. সামাজিক মূল্যবোধ
   খ. নৈতিক মূল্যবোধ
   গ. ধর্মীয় মূল্যবোধ
   ঘ. সব ধরনের মূল্যবোধ

উত্তরমালা: ১. ঘ, ২. গ, ৩. গ, ৪. ঘ

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১. বাংলাদেশের সংবিধানে মূল্যবোধ শিক্ষার কোন কোন দিক প্রতিফলিত হয়েছে?
২. জাতি হিসাবে অগ্রগতি অর্জনের জন্য আমাদের কী ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে?
৩. শিক্ষার মৌলিক উপাদানগুলো কী? ব্যাখ্যা করুন।
৪. শিক্ষক প্রসংগে শিক্ষাবিদ পার্সিভেলরেন প্রদত্ত উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের নৈতিক মূল্যবোধের সংকটের কারণ ব্যাখ্যা করুন।
২. নৈতিক মূল্যবোধের সংকট নিরসনে দার্শনিকবৃন্দের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ- ৪.৫: শিক্ষা ভাবনায় ইতিহাস ও ঐতিহ্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষার সাম্প্রতিক কার্যক্রমগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে।

একটি সভ্য মানব গোষ্ঠী অধ্যুষিত জনপদ হিসেবে বাঙালীর ইতিহাস সুপ্রাচীন। শিক্ষা ব্যক্তি ও সামাজিক উন্নয়নের সবচাইতে শক্তিশালী মাধ্যম। তথ্যের স্বল্পতার কারণে প্রাচীনকালে বাংলায় কোন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল তার বর্ণনা দেওয়া কঠিন। তবে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা লাভ করা যায়। বৈদিক আর্যরা প্রাচীন বাংলার জনগণকে দস্যু ও অসভ্য বলে মনে করত। কিন্তু কালের স্রোতধারায় মৌর্য আমল (৩২১- ১৮৫ খৃস্টপূর্ব) থেকে আর্যভাষা ও সংস্কৃতিই বাংলায় প্রবেশ করে। তবে আনুমানিক খ্রীস্টীয় ছয় শতকের বাংলার পণ্ডিত সমাজ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করেন। সে সময় বৌদ্ধ সংঘারাম এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মকেন্দ্রগুলো ছোট-বড় শিক্ষালয় হিসেবে গড়ে উঠেছিল। তাই দেখা যায়, চিনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন (৩৩৭-৪২২ খৃস্টাব্দ) তাম্রলিপ্তিতে দু'বছর অবস্থান করে অধ্যয়ন ও পুথি নকল করেছিলেন। সাত শতকে যখন হিউয়েন সাং (৬০২-৬৬৪) পুন্ড্রবর্ধন, কামরূপ, সমতট, তাম্রলিপ্তি এবং কর্ণসুবর্ণ ভ্রমণে এসেছিলেন তখন বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি জনগণের জ্ঞানস্পৃহা ও জ্ঞানচর্চার ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ সময় ৬/৭টি বৌদ্ধ বিহারে তিনশর বেশি বৌদ্ধ শ্রমণ, পুন্ড্রবর্ধনের ২০টি বিহারে তিন হাজারের উপর শ্রমণ, সমতটের ৩০টি বিহারে শ্রমণ সংখ্যা দুহাজারের উপর, কর্ণসুবর্ণে ১০টি, বিহারে দুহাজারের উপর এবং তাম্রলিপ্তির ১০টি বিহারে একই সংখ্যক শ্রমণ ছিল। পুন্ড্রবর্ধনের পো-সি-পো বিহার এবং কর্ণসুবর্ণের রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার যে খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল হিউয়েন-সাং-এর সাক্ষ্যই তার প্রমাণ। নালন্দা মহাবিহারের সঙ্গে ছয়-সাত শতকের বাংলার জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এ মহাবিহারের মহাচার্য শীলভদ্র (৫২৯-৬৪৫) ছিলেন বাঙালি। তিনি ছিলেন সমতটের ব্রাহ্মণ্য রাজবংশের সন্তান এবং হিউয়েন সাং-এর গুরু। তিনি অনেক শাস্ত্রে ও সূত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর সময়ে নালন্দা মহাবিহারের শ্রমণ সংখ্যা ছিল দশ হাজার। তাম্রলিপ্তির শিক্ষাদীক্ষার কথা আরও একাধিক চৈনিক শ্রমণের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়। বাংলার বৌদ্ধ বিহার সংঘারামগুলির প্রত্যেকটিই ছিল বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্র। তবে এখানে যে শুধু বৌদ্ধ ধমের চর্চা এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রই পাঠ করা হতো তা নয়, বরং ব্যাকরণ, শব্দবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, চতুর্বেদ, সংখ্য, সংগীত ও চিত্রকলা, মহাযান শাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি জ্ঞানের বিভিন্ন দিকও বৌদ্ধ শ্রমণদের অধিতব্য বিষয়ের অন্তর্গত ছিল। সেই আমলের বিখ্যাত বাঙ্গালি পণ্ডিত ছিলেন অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (৯৮০-১০৫৪)। তিনি পাল সাম্রজ্যের আমলে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচারক ছিলেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান দুই শতাধিক গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন। তিব্বতের ধর্ম, রাজনীতি, জীবনী, স্তোত্রনামাসহ তাঞ্জুর নামে বিশাল এক শাস্ত্রগ্রন্থ সংকলন করেন। বৌদ্ধ শাস্ত্র, চিকিৎসা বিদ্যা এবং কারিগরি বিদ্যা বিষয়ে তিব্বতী ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচনা করেন বলে তিব্বতীরা তাকে অতীশ উপাধীতে ভূষিত করে। অতীশ দীপঙ্কর অনেক সংস্কৃত এবং পালি বই তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন।

প্রাচীন বাংলার বিখ্যাত বৈয়াকরণিক চন্দ্রগোমী চান্দ্র ব্যাকরণ পদ্ধতির স্রষ্টা সাত শতকের পূর্বের এই বৈয়াকরণের জন্মভূমি ছিল বরেন্দ্রীতে। তিনি তর্ক বিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন। দর্শনের আলোচনায় ও বাংলা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। আগমশাস্ত্র গ্রন্থ গৌড় পাদকারিকা এ যুগের লেখা। সাতশতকে যে অলংকৃত কাব্যরীতির সূচনা হয়েছিল তার পূর্ণ বিকাশ হয় পাল আমলে। সমসাময়িক লিপিমালা ও চতুর্ভূজের হরিচরিত কাব্যে দেখা যায় যে, বাংলায় অন্যান্য বিদ্যার সাথে আগম, নীতি, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, মীমাংসা, বেদান্ত, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরণ প্রভৃতি সব কিছু চর্চা হত। পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষাতেই তাদের গ্রন্থাদি রচনা করেন। যেহেতু এ ভাষা সর্বসাধারণের ভাষা ছিল না বলে পাল যুগে জ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রসার শিক্ষিত উচ্চ স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

সেন যুগে সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যাচর্চা, জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার সুবর্ণ যুগ ছিল। সুতরাং প্রাচীন বাংলায় শিক্ষাব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ না করলেও শিক্ষার প্রসারই বিভিন্ন শাস্ত্র চর্চার পথ সুগম করেদিয়েছিল। মধ্যযুগে বাংলার মুসলিম সুলতানগণ তাদের ধর্মীয় দায়িত্বসমূহ পালন করার জন্য প্রাথমিক বা উচ্চতর সবরকম শিক্ষা বিস্তারেই উৎসাহ প্রদান করতেন। শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে শাসক, সুফি, ওলামা, অভিজাতবর্গ, গোষ্ঠী প্রধান এবং জনহিতৈষী ব্যক্তিবর্গ সকলের অবদান রয়েছে। গৌড়, পাণ্ডুয়া, সোনারগাঁও, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী, চট্টগ্রাম এবং রংপুরেও শিক্ষা কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠেছিল।

আর্যদের আগমনের পূর্বে প্রাচীন ভারতীয় আদিবাসীদের ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি এবং সভ্যতার সৃজনে অবদান ছিল গৌরবের এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত। দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর শিক্ষা সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রভাব পড়ে। আর্যদের প্রবর্তিত শিক্ষা ধারায় প্রথমেই সিন্ধু সভ্যতার প্রভাব পড়ে। তারপর নিজেদের ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মীয় সংস্কৃতির ধারায় বৈদিক শিক্ষা সম্প্রসারিত হয়। আবার বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসারের ফলে আর্য প্রবর্তিত শিক্ষা ধারা ও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার ওপর বৌদ্ধ শিক্ষার প্রভাব পড়ে। মৌর্য ও গুপ্ত যুগের শিক্ষা ব্যবস্থায় চৈনিক শিক্ষাগুরু কনফুসিয়াসের প্রাধান্য ছিল। পরবর্তীতে আরবীয় ও পারসিকদের সিন্ধু বিজয়ের মধ্যে দিয়ে সিন্ধু অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে দিল্লীতে সুলতানী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হলে সারা ভারতের প্রাণকেন্দ্রে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে মুসলিম শিক্ষা সংস্কৃতি সারা ভারত বর্ষে ছড়িয়ে পড়ে।

অন্যদিকে বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের মধ্য দিয়ে ভারতের দক্ষিণ পূর্বাংশে বাংলার মুসলিম আধ্যিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে একে একে ভারতবর্ষে গজনীর সুলতান, তুর্কী সুলতান, খিলজি, তুঘলক লোদী, মোঘল সুলতানগণের আমলে শাসন ও শিক্ষা সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যা ১৯৪৭ পর্যন্ত বহাল থাকে এবং ভারতে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তিত হয়। আমরা যদি এ সকল বিষয় পর্যালোচনা করি দেখা যাবে, প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা অনার্য ও আর্যদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হয়েছিল ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, মুসলিম এবং ইংরেজদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারা। অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় কালক্রমে বৈদিক, বৌদ্ধ, আরবীয় এবং ইউরোপীয় শিক্ষা ধারা ও শিক্ষাদর্শন সংযোজিত হয়েছে। যার ফলে জাতি হিসাবে যেমন শংকর তেমনি ভাবে এর শিক্ষাধারা ব্যবস্থাপনাও শংকরতার মধ্যে দিয়েই বর্তমানের আধুনিকতায় পৌঁছেছে। যদি আমরা বাংলাদেশের শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করি তবে দেখতে পাব নিম্নের শিক্ষা ব্যবস্থাগুলো ধারাবাহিকভাবে চলে এসেছে। যেমন–

- আর্য শিক্ষা ব্যবস্থা;
- ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থা;
- সুলতানী শিক্ষা ব্যবস্থা;
- মোঘল শিক্ষা ব্যবস্থা;
- ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থা;
- পাকিস্তান আমলের শিক্ষা ব্যবস্থা;
- বাংলাদেশ আমলের শিক্ষা ব্যবস্থা।

বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামো উন্নত বিশ্বের শিক্ষা কাঠামোর সাথে অধিকাংশই সামঞ্জস্যপূর্ণ। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আধুনিক হয়েছে।

২০১০ সালে বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছ। শিক্ষার সার্বিক লক্ষ্য ও সুনির্দিষ্ট করণীয় নির্ধারিত হয়েছে। নতুন প্রজন্মকে আধুনিক উন্নত বাংলাদেশের নির্মাতা হিসাবে গড়ে তোলার প্রয়াস চলছে। বর্তমানে শিক্ষার হার ৭১ শতাংশ। ২০১৫ সালের অনেক আগেই MDG (Millennium Development Goal)-এর অন্যতম লক্ষ্য জেন্ডার সমতা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে আনা সম্ভব হয়েছে। ২০১০ সাল থেকে সকল ধারায় ১ম শ্রেণি থেকে ৯ম/১০ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতি বছর জানুয়ারিতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদরাসা ও কারিগরী শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। মেয়েদের শিক্ষা মাধ্যমিক পর্যন্ত অবৈতনিক করা হয়েছে। ৪০% শিক্ষার্থীকে (৩০% মেয়ে ১০% ছেলে) উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। সরকার 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' গঠন করে স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে।

এ বছর থেকে উচ্চ শিক্ষায় পি.এইচ.ডিসহ বিভিন্ন গবেষণায় এ বৃত্তি প্রসারিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষা (ICT) ও এর ব্যবহার ব্যাপক ভাবে প্রসারিত হয়েছে। ৪ হাজার ৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৩৩ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ চালু করা হয়েছে। প্রায় ২০ হাজার কম্পিউটার ল্যাব তৈরি করা হয়েছে।

- KOICA-এর সহায়তায় Establishment of IT Labs in Selected Secondary Level Institutions in Dhaka প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর ১০০টি প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছ।
- ১ হাজার ৭ শতটি কম্পিউটার সরবরাহ এবং অনেক শিক্ষককে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ১২৫টি উপজেলায় আইসিটি ট্রেনিং ও রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে UITRCE কেন্দ্রে ২৭ হাজার শিক্ষককে আইসিটি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৩ হাজার ৫ শত ৪৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।
- মাইক্রোসট-এর Partners in Learning (PIL) Program-এর আওতায় শিক্ষকদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে মাইক্রোসফট-এর সাথে MOU স্বাক্ষরিত হয়।
- ৫৭ হাজার ৩ শত ৩৮ জন শিক্ষককে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের উপযোগী ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ২০১৫ সাল থেকে জাতীয় পর্যায়ে ব্যানবেইসের মাধ্যমে অনলাইন জরিপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- এনটিআরসিএ-এর নিয়োগ কার্যক্রম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ ও ভর্তি প্রক্রিয়া, বিভিন্ন পরীক্ষার ফল প্রকাশ, বোর্ডের ফল নিরীক্ষণ, রেজিস্ট্রেশন, পিএসসি পরীক্ষায় আবেদন গ্রহণ, এমপিও কার্যক্রমসহ বিভিন্ন কার্যালয়ের টেন্ডার ইত্যাদি ডিজিটালইজ করা হয়েছে। অনলাইনে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে।
- এনসিটিবি প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক ই-বুকে রূপান্তর ও শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে ওয়েবসাইটে আপলোড করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- a2i ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের যৌথ উদ্যোগে ডিজিটাল কনটেন্ট শেয়ারিং-এর জন্য শিক্ষক বাতায়ন তৈরি করা হয়েছে।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সহায়তায় নির্বাচিত কলেজসমূহের উন্নয়নে ১ হাজার ৫ শত বেসরকারি কলেজে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।
- পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছ।

শুধু তাই নয় বর্তমান সরকারের উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় কারিগরী শিক্ষায় যুগান্তকারী উদ্যোগ ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ইতিপূর্বে কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষার্থী ভর্তির হার ছিল মাত্র ১% যা বর্তমান সরকারের উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় ১৪% উন্নীত হয়েছে।

- ২০২০ সালে কারিগরি শিক্ষায় ২০ শতাংশ ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ডিপ্লোমা কোর্সে আসন সংখ্যা ২৫ হাজার হতে ৫৮ হাজারে বৃদ্ধি করা হয়েছে। ভর্তির ক্ষেত্রে মহিলাদের কোটা ১০ থেকে ২০ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে।
- স্টেপ প্রকল্পের আওতায় সিংগাপুরস্থ নানিয়ান পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ২০১৫ সাল পর্যন্ত মোট ৪২০ জন কারিগরি শিক্ষক-কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
- আইএলও-এর সহায়তায় আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কনস্ট্রাকশন এবং রেডিমেড গার্মেন্ট সেক্টরে ১ লাখ ১০ হাজার জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- শিল্প খাতে দক্ষতা উন্নয়ন, পরিবীক্ষণ, দক্ষতামান ও যোগ্যতা নিরূপণ পর্যালোচনায় ১২টি শিল্প সেক্টরের ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে।
- ২৪টি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ৫ শত ৩০ জন, স্কিলস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের মাধ্যমে ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে, চুক্তিভিত্তিক ২ শত ৮৭ জন শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ডবল শিফট চালু করার ফলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- কিশোরগঞ্জ, মাগুরা, মৌলভীবাজার ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ১টি করে মোট ৪টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে।

- ঢাকায় অবস্থিত টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং বগুড়াস্থ ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ১টি করে নতুন একাডেমিক কাম-ওয়ার্কশপ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে;
- দেশে ৮টি কারিগরি জোনে ৩ তল বিশিষ্ট ৮টি আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় ভবন স্থাপন করা হয়েছে;
- কারিগরি শিক্ষার প্রসারে প্রথম পর্যায়ে ১ শত উপজেলায় ১ শত টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩ শত ৮৯টি উপজেলায় আরও ৩ শত ৮৯টি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপন করা হবে।

সরকারের ভাবনায় কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণে অবশিষ্ট সকল জেলায় বিশ্বমানের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ৪টি মহিলা পলিটেকিনিক ইনস্টিটিউট, ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের প্রতিশ্রুতি আছে। এছাড়া কারিগরী শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিক গবেষণায় ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণে ঢাকায় Bangladesh National Institute of Technical Teachers' Training & Research (BNITTTR) নামে একটি কারিগরী গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে।

অন্যদিকে মাদরাসা শিক্ষার যুগোপযোগী উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়েছে এবং শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ চলছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর হতে প্রাথমিক শিক্ষার অনুরূপ মাদরাসায় এবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় মেধাভিত্তিক বৃত্তি চালু হয়েছে। ২শত ৮১টি মাদরাসায় কারিগরি শিক্ষা কোর্স চালু করা হয়েছে। যুগোপযোগী শিক্ষার সাথে সমন্বয় করে বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষাসহ সাধারণ শিক্ষার সমমানে মাদরাসা শিক্ষাকে উন্নীত করা হয়েছে। প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে এবং উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম, এনসিটিবি, নায়েম, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা বোর্ডসমূহ, এনটিআরসিএসহ সকল প্রতিষ্ঠান, দপ্তর ও কার্যালয়কে গতিশীল ও দুর্নীতিমুক্ত করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত শিক্ষাকে আরো বিস্তরণ করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার সমকালীন বাস্তবতার সাথে সংগতি রেখে দেশের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং জীবন ও জীবিকার সাথে সংশ্লিষ্ট নতুন নতুন বিষয় খোলা হয়েছে। বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে ৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৯ এবং বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯৬টি। উচ্চ শিক্ষাকে গতানুগতিকার বাইরে নিয়ে যেতে সরকার সর্বদা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতি বছর গবেষণার জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল আইন তৈরি হয়েছে এবং তাও মন্ত্রী পরিষদে অনুমোদন হয়েছে। বর্তমানে উচ্চ শিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ রিসার্চ এন্ড এডুকেশন নেটওয়ার্ক (BDREN) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সরকার উচ্চ শিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষাকে যুগোপযোগী এবং বহুমাত্রিক ধারায় বিকাশ ঘটাতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে ফলে উচ্চ শিক্ষার শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩০ লাখে উন্নীত হয়েছে। ইউজিসিকে উচ্চ শিক্ষা কমিশন এ রূপান্তরের লক্ষ্যে আইনের খসড়া চূড়ান্তকরণ হয়েছে। শুধু তাই নয় শিক্ষার মনোন্নয়ন, শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি, নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তোলা, গুণগত মানবৃদ্ধি, গবেষণা, শিক্ষান্নতির লক্ষ্য বাস্তবায়ণের জন্য বিশ্বব্যাংক, ADB, জাইকা প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থার ঋণ সহায়তায় সরকারের ব্যাপক কার্যক্রম চালু আছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৫

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. তাম্রলিপ্তিকে কোন চিনা পরিব্রাজক অধ্যয়ন ও পুঁথি নকল করেছিলেন।
   ক. হিউয়েন সাং
   খ. ফা-হিয়েন
   গ. অতীশ দীপঙ্কর
   ঘ. শীলভদ্র

২. বৌদ্ধবিহারগুলোতে কী বিষয় শিক্ষা দেওয়া হত?
   ক. ব্যাকরণ, শব্দবিদ্যা, হেতু বিদ্যা
   খ. চিকিৎসা বিদ্যা, চতুর্বেদ
   গ. সাংখ্য, সংগীত, চিত্রকলা
   ঘ. উপরের সবগুলো সঠিক

৩. মধ্যযুগে মুসলিম আমলে শিক্ষা বিস্তারে নিচের কাদের অবদান ছিল?
   ক. সুলতানগণের
   খ, অভিজাতবর্গ
   গ. জনহিতৈষী ব্যক্তিবর্গ
   ঘ. উপরে বর্ণিত সকলের

৪. কারিগরী শিক্ষায় বর্তমানে শিক্ষার্থী ভর্তির হার?
   ক. ১৫%
   খ. ১৪%
   গ. ১৬%
   ঘ. ১৭%

উত্তরমালা: ১. ক, ২. ঘ, ৩. ঘ, ৪. খ

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১. বাংলাদেশের শিক্ষার ধারাবাহিক ব্যবস্থাগুলোর নাম লিখুন।
২. শিক্ষক বাতায়ন কাদের যৌথ উদ্যোগে তৈরি করা হয়েছে।
৩. BNITTTR-এর পূর্ণ নাম লিখুন।
৪. শিক্ষার মানোন্নয়নে সহায়তাকারী ২টি আন্তর্জাতিক সংস্থার নাম লিখুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক ইতিহাস লিখুন।
২. শিক্ষার মানোন্নয়নে সাম্প্রতিক কার্যক্রমগুলো উল্লেখ করুন।
৩. কারিগরী শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো আলোচনা করুন।